৩. দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহজাহানের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের চারটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্তির সময় থেকেই আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগের সূত্রপাত। কিন্তু সিংহাসনে না বসা পর্যন্ত তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দক্ষিণি রাজ্যগুলির সম্পর্কের চারটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়টি ১৬৬৮ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী। এই পর্বে তিনি ১৬৩৬ খ্রি.-এর চুক্তি অনুযায়ী আহমেদনগর কর্তৃক বিজাপুরকে প্রদত্ত অঞ্চলগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়টি ১৬৮৪ খ্রি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে মারাঠা শক্তির উত্থান। বাদশাহ চেষ্টা করেছিলেন বিজাপুর ও গোলকোন্ডার ওপর চাপ সৃষ্টি করে মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের মোগলপক্ষে আনতে। তৃতীয় পর্যায়ের স্থায়িত্ব ১৬৮৭ খ্রি. পর্যন্ত। এই পর্বে আওরঙ্গজেব উক্ত রাজ্যদুটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের অধিকার করতে মনস্থ করেন। চতুর্থ পর্যায়ে, ১৭০৭ খ্রি.-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

(ক) প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্যায়ে লক্ষ করা যায় আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে বিজাপুররাজ আদিল শাহের সাহায্য লাভে ব্যর্থ হন। সেনাপতি জয় সিংহকে তিনি শিবাজী ও আদিল শাহ উভয়কেই শাস্তি দেওয়ার আদেশ দেন। জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বাদশাহ সীমাবদ্ধ আগ্রাসনের কথা বলেন। ১৬৬৫ খ্রি.-এ জয় সিংহের বিজাপুর আক্রমণ ব্যর্থ হয়। মোগলবাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। আওরঙ্গজেব হতাশ হন। জয়সিংহ তীব্রভাবে ভর্ৎসিত হয়ে ১৬৬৭খ্রি.-এ মারা যান। পরের বছর মোগলরা উৎকোচ প্রদানের দ্বারা শোলাপুর অধিকার করে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম আট বছর আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হল গোলকোন্ডায় মাদান্না ও আখান্না নামে প্রতিভাবান ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্থান। ১৬৭২ থেকে ১৬৮৭ খ্রি. পর্যন্ত

তাঁরাই ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নীতিনির্ধারক। তাঁরা গোলকোন্ডা, বিজাপুর ও মারাঠাদের মধ্যে মোগলবিরোধী এক ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বিজাপুর রাজসভার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও শিবাজীর উচ্চাশা এই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। বাদশাহ তখন দাক্ষিণাত্যে সাবধানী নীতি অনুসরণ করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কাতর বিজাপুর রাজসভায় এমন একটি দলকে ক্ষমতায় আনা যারা শিবাজী ও গোলকোন্ডার বিরুদ্ধে মোগলদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। খাওয়াজ খান নামে এক আমির তাঁর প্রতিপক্ষ আফগানদের দমন করার শর্তে মোগলদের সাহায্য করতে রাজি হন। কিন্তু দ্রুত তাঁর পতন হয়। ১৬৭৬ খ্রি.-এ বিজাপুরে মোগল হস্তক্ষেপ ঘটে। বিজাপুর ও গোলকোন্ডার সম্মিলিতবাহিনীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও মোগলরা নালদুর্গ ও গুলবর্গা দখল করে নেয়। মারাঠা ও গোলকোন্ডাবিরোধী শক্তিজোট গঠনে মোগলরা পুনরায় ব্যর্থ হয়।

বিজাপুর ও গোলকোন্ডা উভয়ের কাছেই শিবাজী ছিলেন এক অনিশ্চিত মিত্র। বিজাপুরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাঁরও হাত ছিল। বিজাপুরের নাবালক সুলতানের অভিভাবক দক্ষিণি গোষ্ঠীর নেতা সিদি মাসুদ একই সঙ্গে শিবাজী ও মোগলদের সঙ্গে মৈত্রী আলোচনা শুরু করেন। মোগলরা সুকৌশলে এই আলোচনা ভেঙে দেয় ও ১৬৭৯ খ্রি.-এ বিজাপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনটি দক্ষিণি রাজ্যের মিলিত প্রতিরোধে মোগল সেনাপতি দিলির খান পরাস্ত হন। বিজাপুর রক্ষার্থে শিবাজী এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। তা ছাড়া মোগল অঞ্চলগুলিতে হামলা চালিয়ে তিনি তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। দ্বিতীয় পর্যায়েও দাক্ষিণাত্যে মোগলনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(গ) তৃতীয় পর্যায় : তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় আওরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত থেকে শিবাজীপুত্র সম্ভাজীর বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত এবং বিজাপুর গোলকোন্ডাকে মারাঠাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় রত। মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে আওরঙ্গজেব বিজাপুর রাজ্যের ভেতর দিয়ে মোগলসেনার অগ্রসরের অধিকার দাবি করেন। তা ছাড়া সামন্তরাজ হিসাবে বিজাপুর সুলতানকে ছ-হাজার অশ্বারোহী প্রেরণ করতে বলা হয়। এই পরিস্থিতিতে গোলকোন্ডা ও মারাঠাগণ বিজাপুরের সমর্থনে এগিয়ে আসে। কিন্তু এবার সম্মিলিতবাহিনী বাদশাহ পরিচালিত মোগলবাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়। ১৬৮৬ খ্রি.-এ বিজাপুরের পতন হয়।

বিজাপুরের পতনের পর গোলকোন্ডার প্রতি আওরঙ্গজেব নজর দেন। সুলতান কুতুব শাহ কর্তৃক মারাঠাদের সহযোগিতা, নিষেধ সত্ত্বেও বিজাপুরকে সামরিক সাহায্য দান প্রভৃতি কারণে ইতিপূর্বে ১৬৮৫ খ্রি.-এ আওরঙ্গজেব গোলকোন্ডা অবরোধ করেন। ১৬৮৭ খ্রি.-এ গোলকোন্ডার পতন হয়। মাদান্না ও আখান্না নিহত হন। সুলতান প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। কিছু অঞ্চলও তিনি মোগলদের সমর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যে মোগলরা সামরিক সাফল্য অর্জন করলেও বিজাপুর ও গোলকোন্ডার পতন নানাবিধ সমস্যার সূচনা ঘটায়। বস্তুত, আওরঙ্গজেবের জীবনের সর্বাপেক্ষা সমস্যাসংকুল অধ্যায়ের এখান থেকেই শুরু।

(ঘ) চতুর্থ পর্যায় : চতুর্থ পর্যায়ে আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ণ শক্তি মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্ভাজী মারাঠাদের নেতৃত্বে আসেন। আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে তিনি আশ্রয় দেন। কিন্তু আকবরকে সামনে রেখে মোগল ভূখণ্ড আক্রমণের পরিবর্তে তিনি তাঁর প্রতি উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। ১৬৮৬ খ্রি.-এ আকবর তাঁর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তিনি মারাঠা সাহায্য পাননি। হতাশ আকবর সমুদ্রপথে পারস্যে পলায়ন করেন আশ্রয়ের খোঁজে। ভ্রান্তনীতির মূল্য সম্ভাজীকে দিতে

হয়। তিনি দ্রুত মোগলদের দ্বারা ধৃত ও নিহত হন। এ ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। মারাঠানেতার সঙ্গে কোনো সমঝোতায় না এসে তাঁকে হত্যা করার ফলে যুদ্ধবাজ মারাঠাসর্দারগণ নেতৃত্বহীন অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। সম্ভাজীর ভ্রাতা রাজারাম মারাঠাদের রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ব উপকূলের জিঞ্জিতে আশ্রয় নেন ও সেখান থেকে মোগলবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যান।

১৬৯০ থেকে ১৭০৩ খ্রি. পর্যন্ত আওরঙ্গজেব মারাঠাদের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের যুদ্ধে শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত মোগল সেনাবাহিনীর মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মারাঠাদের অতর্কিত আক্রমণ মোগলবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়। কোনো কোনো মোগল জাগীরদার গোপনে মারাঠাদের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হয়। ১৭০৩ খ্রি.-এ আওরঙ্গজেব বাধ্য হয়ে শান্তি আলোচনা শুরু করেন। তিনি সম্ভাজীর পুত্র শাহুকে মুক্তি দিয়ে শিবাজীর রাজ্য ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু শেষমুহূর্তে তিনি মত পরিবর্তন করেন। ১৭০৬ খ্রি. নাগাদ আওরঙ্গজেব তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা উপলব্ধি করেন। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও হতাশ বাদশাহ ক্রমশ আহমেদাবাদে পিছু হঠে আসেন। পরের বছর তিনি যখন মারা যান, তখন মারাঠাগণ একের পর এক হৃত অঞ্চল ও দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করে চলেছে।

(ঙ) মূল্যায়ন : দীর্ঘদিন পূর্বে মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ও ভিনসেন্ট স্মিথের মতো ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ দাক্ষিণাত্য নীতির ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অদূরদর্শিতার অভিযোগ এনেছেন। এঁদের মতে বাদশাহের উচিত ছিল দুটি দক্ষিণি মুসলমান রাজ্যকে ধ্বংস না করে তাদের সহযোগিতায় মারাঠাদের আঘাত করা। আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন ক্ষয়িষ্ণু দক্ষিণি রাজ্যগুলির পক্ষে স্বাধীনতাকামী মারাঠাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। আচার্য যদুনাথ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি জয় করাকে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সব মোগল সম্রাটদের 'বিনিদ্র লক্ষ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য যুদ্ধকে নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মোগল সাম্রাজ্য এত বিশাল আকার ধারণ করে যে, কোনো একটি কেন্দ্র থেকে একজন মানুষের পক্ষে তা শাসন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে আওরঙ্গজেব 'হজম শক্তির চেয়ে বেশি গলাধঃকরণ করেছিলেন।' মোগল সাম্রাজ্য আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয় পড়ে। তাঁর মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়। মারাঠাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি অনুসরণ করায় তারা আত্মরক্ষার্থে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করে। অন্যান্য মোগলবিরোধী শক্তির সঙ্গে একযোগে তারা সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাত হানে। বাদশাহের দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকার ফলে উত্তর ভারতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্থানীয় রাজা ও জমিদারগণ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দক্ষিণি যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় রাজকোশ শূন্য করে দেয়। বকেয়া বেতনের দাবিতে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

সতীশ চন্দ্র আচার্য যদুনাথের সঙ্গে একমত হয়েছেন যে মারাঠা অভ্যুত্থান ও এই অঞ্চলে তাদের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রশ্নে মোগলদের চ্যালেঞ্জ দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু সতীশ চন্দ্র মনে করন মোগল সাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ভূমিকাকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে

দাক্ষিণাত্যে মোগল বিজয়ের 'অবশ্যম্ভাবিতা' বা 'মোগল সাম্রাজ্য তার নিজের ভারে ভেঙে পড়ে' প্রভৃতি তত্ত্ব দিয়ে মোগলনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। দাক্ষিণাত্যে মোগলনীতির বিবর্তনকে অনুধাবন করতে হবে সাম্রাজ্যের বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে। মারাঠাদের দমন করা, দাক্ষিণাত্যের ভূম্যধিকারী শ্রেণির সঙ্গে সমঝোতায় আসতে মোগলদের ব্যর্থতা, জাগীর থেকে মনসবদারদের রাজস্ব আদায়ের অক্ষমতা, শক্তিশালী আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ও কৃষক শোষণ বন্ধ করতে মোগল প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা প্রভৃতির ফলে এক গুরুতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভ্রাতৃযুদ্ধ ও অভিজাতবর্গের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সমস্যাগুলিই আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

মারাঠা যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক স্থিতি বিনষ্ট এবং কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাহত করলেও মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করত। তবে দাক্ষিণাত্যনীতির ব্যর্থতা আওরঙ্গজেবকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।*